ভূতের পাল্লায় গোপাল ভাঁড়

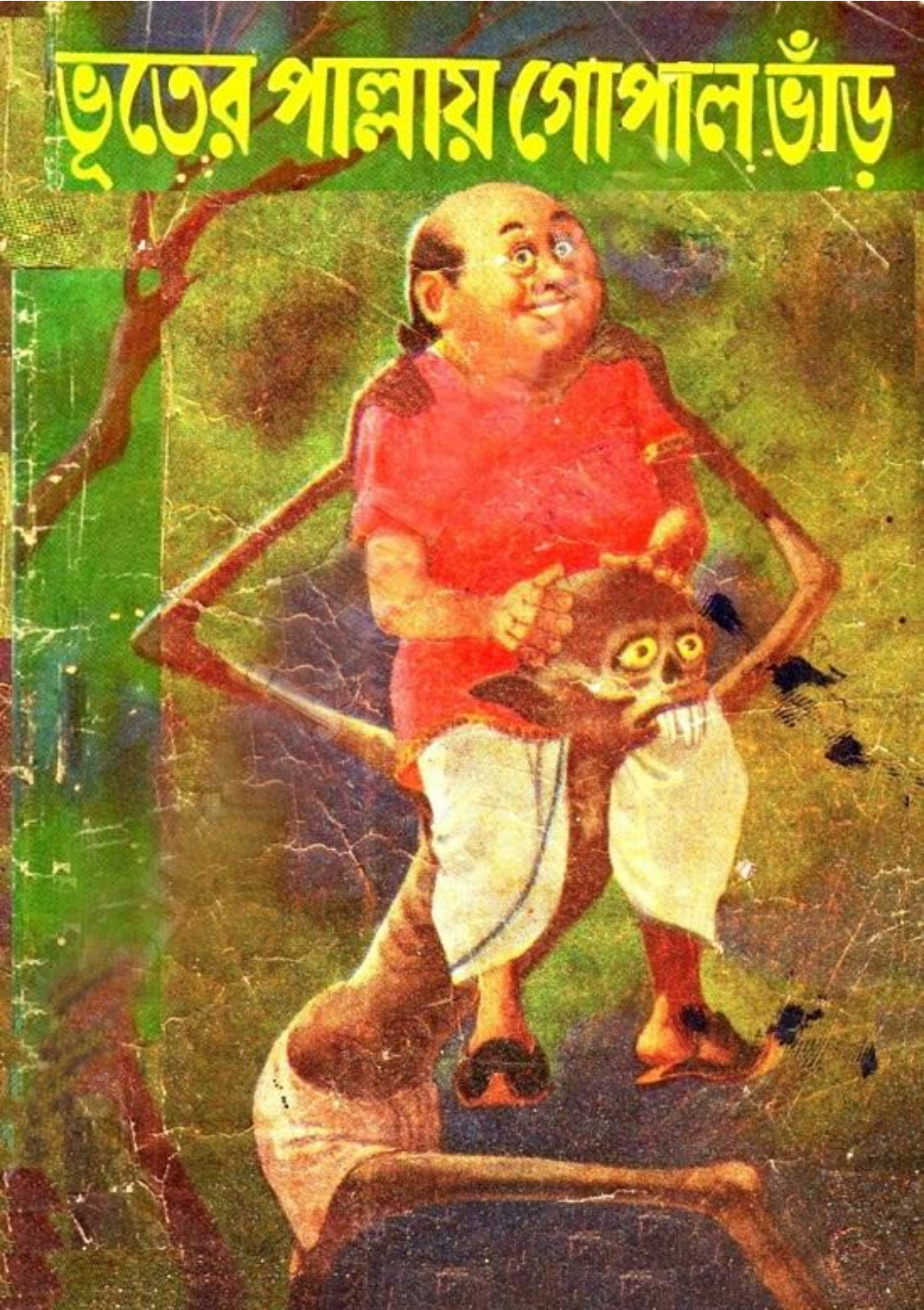

ভূতের পাল্লায় গোপাল ভাঁড়

মণ্টু চক্রবর্তী

www.shishukishor.org
www.dlobl.org

নির্ম্মলা পাবলিকেশন
৪২, পার্বতী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৮৯

অনুরোধ

যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে এই প্রজেক্টকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোন ডোনেশন চাই না আমরা। আপনার দেওয়া অর্থর জন্য আমরাও কিছু দিতে চাই আপনাদের।

অনুগ্রহ করে www.dlobl.org তে অংশগ্রহণ করুন। অংশগ্রহণ ফি প্রতিমাসে মাত্র ৩০ টাকা। যার বিনিময়ে আপনি প্রতিমাসে পাবেন বড়দের উপযোগী ৪ (চারটি) বই। আপনার দেওয়া এই অর্থ দিয়ে তৈরী হবে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রতিমাসের মাত্র ৩০ টাকাই দিতে পারে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ইন্টারনেট দুনিয়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনিও আমাদের এই পথচলায় সামিল হোন। সকলে মিলে এগিয়ে চললে, আমাদের পথচলা মসৃণ হবে। আমরা মনে সাহস পাবো।

ধন্যবাদ

শিশির শুভ্র

এতে আছে

ভূতের গাল্লায় গোপাল ভাঁড়.....5

হানা বাড়ীতে গোপাল ভাঁড়.....21

ভূতের বিয়েতে গোপাল ভাঁড়.....30

গোপালের পাল্লায় মামদো.....39

ভূতের গাল্লায় গোপাল ভাঁড়

ছোট দাদু সেদিন সকাল সকাল এসে বৈঠকখানা ঘরে বসতেই, নাতি নাতনীরা সবাই এসে জড়ো হলো তার কাছে। তারপর সকলে চীৎকার করতে লাগলো—দাদু! একটা গল্প বল—দাদু একটা গল্প বল।

ছোট দাদু বললেন—এ সময় গল্প শুনিবি কিরে? তোদের পড়াশোনা নেই?

পেঁকো-অর্থাৎ পঙ্কজ বললে—না, আজ আর পড়াশোনার ঝামেলা নেই। ইস্কুল তো চারদিন বন্ধ।

ছোটদাদু বললে— ইস্কুল বন্ধ তো হয়েছে কি? তাই বলে পড়াশোনা করতে হবে না।

ছোট বোন বিনি বললে—সে হবেখ'ন দাদু! আজ একটা গল্প বল।

এই কথা বলে আবার সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করলো।

দাদু তখন আরাম করে বসে বললে—আচ্ছা! সবাই চুপ কর। একটা বেশ ভাল গল্প তোদের বলছি।

দাদুর কথা শুনে সবাই চুপচাপ গিয়ে তার কাছে বসলো। দাদু গল্প বলতে শুরু করলেন।

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা গোপাল ভাঁড়ের নাম শুনেছিস?

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। —শুনেছি।

কেউ বললে—আমি গোপাল ভাঁড়ের গল্পের বই পড়েছি। কেউ বললে—সিনেমায় দেখেছি।

দাদু বললে—তাহলে তো ভালই হলো। নতুন করে আর গোপাল ভাঁড়ের পরিচয় দিতে হবে না।

বিনি বলল— না না, তুমি গল্প বল।

দাদু বললে—তাহলে শোন।

একদিন গোপাল ভাঁড় রাজসভা থেকে ফিরে আসতে তার স্ত্রী বললে—একবার বাজারে যাও তো?

গোপাল বললে— কেন?

গোপালের স্ত্রী বললে— বাজার থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে এসো। আজ ইলিশ মাছ খেতে খুব ইচ্ছে হয়েছে।

গোপালের হাতে সেদিন টাকা পয়সা ছিল না। স্ত্রীর বায়না শুনে সে মুখ কাঁচু মাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তাই দেখে গোপালের স্ত্রী বললে—কি গো! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাজারে যাও।

গোপাল আস্তে আস্তে বললে— আজ আমার কাছে টাকা পয়সা নেই। ইলিশ মাছ বরং অন্যদিন খেও।

গোপালের বউ এই কথায় রেগে গিয়ে বললে— যার বউকে খেতে দেবার মুরোদ নেই, সখ-সাধ মেটাবার মুরোদ নেই, তার আবার বিয়ে করা কেন? বিয়ে করলে যে বউয়ের সাধ আহ্লাদ মেটাতে হয় জান না।

গোপাল একটু হেসে বললে—দেখ, বিয়ে করা বউ হলো স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। তার সুখ-দুঃখের ভাগীদার।

বউ মুখ নাড়া দিয়ে বললে—থামো থামো, আর ন্যাকামো করো না। কথায় আছে না।—ভাত দেবার কেউ নয়, কিলমারবার গোঁসাই। আমায় ধম্মকথা বলে ভোলাচ্ছেন।

গোপাল বললে—ধর্ম্মকথা নয়। বউ, এটা হোলো শাস্ত্রের কথা।

বউ বললে—তোমার অমন শাস্ত্রের মুখে ঝ্যাঁটা মারি, আর তোমার মুখেও ঝ্যাঁটা মারি।

এই কথা শুনে গোপাল খুব দুঃখিত হলো মনে মনে। সে ভাবলে কি! এত অহঙ্কার। সামান্য অর্থের জন্য নিজের স্ত্রী হয়ে এত অপমান। আর বাড়ীতে থাকব না, যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই চলে যাব।

মনে মনে এই রকম চিন্তা করে গোপাল তখনকার মত চুপ করে রইলো।

দুপুর বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গোপাল তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

গোপাল চলেছে তো চলেছেই, কোন দিকে তার খেয়াল নেই।

এইভাবে অনেকদূর এসে পড়ল গোপাল। যখন তার হুঁস হলো তখন সূর্য্যদেব অস্ত গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে চারদিকে।

হঠাৎ তার পায়ে একটা ঠোক্কর লাগলো। নিচুদিকে তাকিয়েই গোপাল দেখল, তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা পোড়া কাঠ। সে তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে সেটা একটা শ্মশান।

চারদিকে ধুধু করছে মাঠ। কোথাও লোকজনের বাড়ী ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে মড়ার মাথা, পোড়া কাঠ আর হাড়গোড় ছাড়ানো

রয়েছে। তার সামনে একটু দূরেই একটা চিতা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। মনে হচ্ছে কারা যেন সদ্য মড়া পুড়িয়ে গেছে।

এই সব দৃশ্য দেখে গোপাল ভয় পেয়ে গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্য হাঁটতে লাগলো।

কিন্তু তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। তার উপর আবার আকাশে মেঘ জমেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

চলতে চলতে গোপাল বার বার হোঁচট খেতে লাগল।

এমন সময় একসঙ্গে কতকগুলো শেয়াল ডেকে উঠল। গোপাল চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, সে সেই শ্মশানের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে পথ হারিয়ে।

গোপাল কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে চারিদিকে পথের সন্ধান করতে লাগলো। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না অন্ধকারে।

আকাশ তখন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছেন চোখে, এমন সময় তার চোখে পড়ল একটা মস্ত বড় বটগাছ।

গোপাল আস্তে আস্তে সেই বটগাছের কাছে গিয়ে, কোন রকমে তার মাোটা সোটা দেহটা নিয়ে গাছের উপর উঠে বসল।

এদিকে সারারাত ধরে মড়ার মাথা আর হাড়গোর নিয়ে কুকুর শেয়ালে খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগলো।

রাত যখন গভীর এমন সময় একটা ভূত এসে সেই বটগাছের তলায় বসলো।

তার চেহারা দেখে গোপালের বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। সারা গায়ে ঘাম ছুটতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো এবার যদি প্রাণে

বঁচি, আর কখনও গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করবো না। হে মা কালী! এবারের মত বাঁচিয়ে দাও মা।

গোপালের যখন এই অবস্থা। তখন আরও চারটি ভূত এসে বসলে সেই বটগাছের তলায়। এবার তাদের মধ্যে নাকি সুরে কথাবর্তা হতে লাগলো।

গোপাল প্রথমটা ভয় পেলেও, সে ছিল খুব চতুর আর বুদ্ধিমান, তাই সে কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

প্রথম ভূতটা বললে—এ্যাই। তোদের এত দেরী হলো কেন?

দ্বিতীয় ভূত বললে— কর্তা, আমরা চারপাশ ঘুরতে ঘুরতে এলুম, তাই দেরী হয়ে গেল।

প্রথম ভূত বললে—ঘুরে ঘুরে কি দেখলি?

তৃতীয় ভূত বললে—কামার পাড়ায় একজন মরেছে।

চতুর্থ বললে— কুমোর পাড়াতেও একজন মরেছে।

পঞ্চম বললে—ঘোষ পাড়ায় একজন মরেছে।

দ্বিতীয় বললে— বাঃ—ভারী মজা তো, কলু পাড়াতেও একজন মরেছে দেখে এলুম।

প্রথম ভূত বললে—তাহলে মোট চারজন মরেছে আজ?

পঞ্চম ভূত বললে—হ্যাঁ কর্তা।

দ্বিতীয় ভূত বললে—আচ্ছা কর্তা। ওই মড়া চারটিকে তুলে নিলে কেমন হয়?

সকলে বললে—ভালই হবে—ভালই হবে।

প্রথম ভূত তখন গম্ভীরভাবে বললে—হুঁ, তোদের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন তাই কর, চারটে মড়াই তুলে নে।

গোপাল তখন মনে মনে বললে— চারটে নয়রে শালারা আমাকে নিয়ে পাঁচটা হবে। তবে মরার আগে একবার তোদের একটা খেল দেখিয়ে যাব। আমার নাম গোপাল ভাঁড়।

এমন সময় প্রথম ভূতটা একজন ভূতকে বললে—'ওরে হামদে, আমার পা-টা একটু টিপে দে।

দিচ্ছি কর্তা। বলে যেই হামদো এগিয়েছে। অমনি গাছের উপর থেকে হেঁড়ে গলায় গোপাল বললে—এই ব্যাটা হামদো। এদিকে আয়।

গাছের উপর গলার আওয়াজ পেয়ে, ভূতগুলো চমকে গাছের উপর চেয়ে দেখলে একটা নাদুস-নুদুস ভুঁড়িওলা বেঁটে মানুষ!

ভূতগুলো অবাক হয়ে গোপালকে দেখতে লাগলো।

গোপাল তখন চোখ পাকিয়ে আরও গম্ভীরভাবে ডাকলে—'এ্যাই বেটা হারামজাদা। কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি! এখনি তোর শ্রাদ্ধ করবো। তোর চোদ্দ পুরুষ আমার বাড়ীতে চাকরী করেছে। তুই ব্যাটা মস্তান হয়েছিস? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

গোপালের কথায় হামদো ভয় পেয়ে বললে—অজ্ঞে আমার দোষ কি?

ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে, গোপাল সাহস করে গাছ থেকে নামল। তারপর হামদোর দিকে চেয়ে বললে—ব্যাটা, খুব যে লায়েক হয়েছিস। তোর বাপ-ঠাকুর্দা আমার বাড়ীতে চাকর ছিল।

প্রথম ভূত বললে— ওর চৌদ্দপুরুষ যে তোমার বাড়ীতে চাকরী করেছে তার প্রমাণ দিতে পারবে?

গোপাল বলল—বলিস কিরে, জলজ্যান্ত প্রমাণ করে দেবো।

হামদো বললে—আমার বাবার নাম কি বল দেখি?

গোপাল বললে- তুই একটা আস্ত ভূত। তাই তোর বুদ্ধি-শুদ্ধিও নেই। আমাদের বাড়ীতে কি একটা চাকর। তোর বাবার মত কত ব্যাটা চাকর রয়েছে। সকলের নাম কি আর মনে আছে? সব খাতায় লেখা আছে। চল আমার সঙ্গে চাকরী করবি চল এখন আমার বাড়ীতে তিরিশটা ভূত দিনরাত খাটছে। তুইও খাটবি চল।

প্রথম ভূতটা তখন বললে—দেখ, তুমি যদি ওর বাপ ঠাকুর্দার নাম বলতে পার, তাহলে হামদো তোমার সঙ্গে যাবে।

ভূতগুলোর সঙ্গে গোপালের কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় দূরে হরিবোল শব্দ শোনা গেল।

শব্দ শুনেই ভূতগুলো ছটফট করতে লাগলো। কর্তা ভূত বললে— আমাদের কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দাও, একঘণ্টা পরে ফিরে আসব।

গোপাল বললে— তাকি হয়? তোরা যদি আর ফিরে না আসিস?

কর্তা ভূত বললে—নিশ্চয়ই আসব। এটাই তো আমাদের অস্তানা।

গোপাল বললে— তোরা কোথায় যাবি?

হামদো বললে— এখনও আমরা কিছু খাইনি, তাই খাবার যোগাড় করতে যাচ্ছি।

গোপাল তাদের কাকুতি মিনতি দেখে বললে—আচ্ছা যা, কিন্তু একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবি। তা না হলে ব্রহ্মদত্যি আর মামদোকে - পাঠিয়ে ঘাড়ে ধরে আনবো।

ব্রহ্মদত্যি আর মামদোর কথায় কর্তা ভূতটারও ভয় হলো। কারণ ব্রহ্মাদিত্য হলো বামুন ভূত আর মামদো হলো মুসলমান। এরা দুজনেই বেশ শক্তিশালী। ভূত মহলে এদের সবাই ভয় করে। তাই সকলে হাত যোড় করে গোপালকে বললে আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবো।

এই কথা বলে গোপালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

ওদিকে বল হরি হরিবোল বলতে বলতে কতগুলো লোক একটা মড়া নিয়ে আসছিল শ্মশানে।

এমন সময় ভূতগুলো হাঃ-হাঃ-হিঃ-হিঃ করতে করতে লম্বা লম্বা। হাত পা বাড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই, লোকগুলো মড়া ফেলেই যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালো।

ভূতগুলো তখন এসে মনের আনন্দে মড়াটাকে খেতে লাগলো। কড়কড় মড়মড় করে হাড় চিবোতে চিবোতে চিবোতে কর্তাভূত বললে—এ্যাই, সব তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে না গেলে লোকটা আবার ব্রহ্মদত্যি আর মামদোকে পাঠাবে।

সবাই তখন তাড়াতাড়ি খেতে লাগলো। প্রায় আধন্টার মধ্যে গোটা মড়াটাকে শেষ করে হাড় চিবোতে চিবোতে আবার পাঁচজনে এসে হাজির হলো।

ওদিকে দূর থেকে ভূতগুলোকে আসতে দেখে, গোপাল বটগাছে হেলান দিয়ে বসে জোরে জোরে নাক ডাকাতে লাগলো।

ভূতগুলো গাছতলায় ফিরে এসে দেখলে লোকটা ঘুমুচ্ছে। আর নাক ডাকছে।

কর্তাভূত তখন ফিসফিসিয়ে বললে— এই চল, আমরা গাছের পিছন দিকে গিয়ে বসি। ওকে জাগাসনি ঘুমুতে দে, সকাল হলেই আমরা কেটে পড়বো।

সকলে বললে—সেই ভালো। এই বলে সকলে সেই বটগাছের পিছনে বসলো।

গাছে হেলান দিয়ে বসে কর্তা ভূতটা হামদোকে চুপি চুপি বললে — হ্যাঁরে হামদো। লোকটা যদি সত্যি সত্যিই তোর বাপ-ঠাকুর্দার নাম বলে দেয়। তাহলে কি হবে?

দ্বিতীয় ভূতটা বললে—ত পারবে না কর্তা। ও কি করে নাম জানবে?

আর একজন বললে—ঠিক বলেছিস। ও কি করে নাম জানবে? হামদোই হয়ত সব নাম জানেনা।

হামদো এই কথায় রেগে গিয়ে বললে—কেন জানবো না, আমার বাপ-ঠাকুর্দার নাম আমি জানবো না তো কে জানবে?

দ্বিতীয় ভূত বললে—বেশ বলতে দেখি নামগুলো?

হামদো বললে—আমার নাম হামদো, বাবার নাম—আমদো, ঠাকুর্দার নাম-লামদো, তার বাবার নাম—জামদো। ‘

কর্তা বললে— ব্যাস-ব্যস, ঐ হলেই হবে। এই রকম বললেই হল।

এদিকে গোপাল ঘুমের ভাণ করে পড়ে থেকে সব শুনে নিল এবং মুখস্থ করে ফেললে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠলো—কইরে। কোথায় গেলি তোরা সব। এদিকে আয়।

গোপাল ডাকতেই ভূতগুলো এসে হাজির হলো গোপালের কাছে।

গোপাল তাদের বললে—এই, তোরা সব হামদোর বাপ ঠাকুর্দার নাম জানতে চেয়েছিলি না, নামগুলো সব মনে পড়েছে।

তখন কর্তা ভূতটা বললে—বেশ বল নামগুলো।

গোপাল তখন ঠিক যেমন শুনেছিল, তেমনিভাবে নামগুলো বললে।

কর্তা ভূত সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললে—হামদো, ইনি যখন তোর বাপ ঠাকুর্দার নাম বলেছে, তখন তুই ওর বাড়ীতে যা।

হামদো তখন কঁচুমাচু হয়ে বললে—হ্যাঁ, তাতো যেতেই হবে। তবে আমার একটা কথা আছে।

—বেশ, কি কথা আছে বল?

—চল, রাস্তায় যেতে যেতেই বলব।

—বেশ তাই হবে। কিন্তু আমি তো হেঁটে যেতে পারবো না। আমায় কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে চল। হামদো আর কি করে, গোপালকে কাঁধে নিয়ে ঝড়ের বেগে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। পথে যেতে যেতে হামদো গোপালকে বললে—দেখ কর্তা। আমি তোমার কাজকর্ম করবো বটে, কিন্তুদিনের বেলায় আমাকে দেখতে পাবে না। রাত্রি বেলা এসে তোমার সব কাজকর্ম করে যাব।

—বেশ তাই হবে।

—আরও একটা সর্ত আছে।

—বল কি সর্ত?

—রোজ আমাকে কাজ দিতে হবে। বসে থাকতে পারব না। বসে থাকলেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে আমি তোমার ঘাড় মটকাবো।

—বেশ, তাই হবে। এইভাবে কথা বলতে বলতে হামদো গোপালকে নিয়ে বাড়ীর কাছে এসে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে —কর্তা, তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও, এখন আমি চললাম। সকাল হতে আর দেরী নেই, আর আমার থাকা চলবে না। কেউ দেখে ফেলবে। কাল আবার রাত্রে আসবো। আমার কাজ-কর্ম ঠিক করে রেখো।

এই কথা বলে হামদো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

গোপাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দরজার কড়া নাড়া দিলে।

গোপালের স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি গো! তুমি সারাদিন সারারাত কোথায় গেছলে? গোপাল তখন একে একে বাড়ী থেকে গিয়ে অবধি যা যা ঘটেছিল, সবই বললে। সব শুনে গোপালের বউ একগাল হেসে বললে—দেখলে তো আমার ঝগড়া করার গুণ। আমি ঝগড়া না করলে তুমিও বাড়ী থেকে যেতে না। আর এসব ঘটনাও ঘটতো না।

গোপাল বললে—দ্যাখ গিন্নী, আর বকবক করে লাভ নেই। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। সকাল হয়ে গেছে। তুমি কাজকর্ম সেরে দু'টো যাহোক কিছু রান্না-বান্নার যোগাড় কর।

দেখতে দেখতে সারাদিন কেটে গেল। গোপাল সারাদিনটা ঘুমিয়ে কাটালে।

রাত্রিবেলা বাড়ীর সকলে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। গোপাল কিন্তু জেগে বসে রইলো।

রাত্রি যখন বারোটা, এমন সময় হামদো এসে হাজির।

এসেই সে গোপালকে বললে-বল, কি কাজ করতে হবে?

গোপাল বললে-আমার বাগানটা জঙ্গল হ'য়ে পড়ে আছে। ওটাকে ভাল ক'রে পরিষ্কার করে দে।

সঙ্গে সঙ্গে হামদো চলে গেল বাগান পরিষ্কার করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাগান পরিষ্কার করে ফিরে এসে গোপালের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

এইভাবে রোজই হামদো এসে গোপালের কাজ ক'রে যেতে লাগলো।

গোপালের দিন দিন উন্নতি দেখে পাড়ার লোকের হিংসা হলো। তারা ভাবতে লাগলো, গোপাল এত পয়সা পাচ্ছে কোথায় যে, বাড়ীঘর মেরামত করছে। বাগান পরিষ্কার করছে, পুকুর কাটছে। এই সব ভেবে পাড়ার লোক জ্বলে মরতে লাগলো। শেষ একদিন তারা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সব কথা জানালে।

পরদিন গোপাল রাজসভায় আসতে মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেন — আচ্ছা গোপাল! তুমি যে বাড়ী, বাগান পরিষ্কার করছ। পুকুর কাটাচ্ছে এতে টাকা-পয়সা খরচ হচ্ছে। এসব কে দিচ্ছে?

গোপাল হাতযোড় করে বললে—মহারাজ! আমি কিছুই বলতে পারবো না। রাত্রে ঘুমিয়ে থাকি, আর সকালে উঠে দেখি সব কাজকর্ম কে ক'রে গেছে।

গোপালের কথা শুনে মহারাজ হেসে উঠলেন। তারপর বললেন — আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও, আমি সন্ধান নিচ্ছি।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রাজা গোপালের প্রতিবেশীকে ডেকে বললেন আজ তোমরা সারারাত্রি জেগে গোপালের বাড়ী পাহারা দেবে। তাহলে বোঝা যাবে কে গোপালের কাজ করে দেয়।

গোগাল তখন ওই সব লোকগুলোকে জব্দ করবার জন্য মনে মনে বুদ্ধি এঁটে হামদো আসতেই তাকে বললে—হামদো, তুই তোর আর একজন বন্ধুকে নিয়ে রাজকর্মচারী সেজে আয়।

হামদো সঙ্গে সঙ্গে তার একবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাজকর্মচারী সেজে গোপালের কাছে হাজির হলো।

গোপাল বললে—যাও তোমরা, আজ তোমাদের কোনও কাজ করতে হবে না।

হামদো বললে—তাহলে আমরা কি করবো? গোপাল বললে-আমার বাড়ীর চারপাশে জনকতক লোক পাহারা দিচ্ছে। তোমরা তাদের রাজার হুকুম জানিয়ে সারারাত ধরে আমার নতুন পুকুরের মাটি কাটাবে।

হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে হামদো তার বন্ধুকে নিয়ে চলে গেল। তারপর তারা দেখলে সত্যি কয়েকজন লোক গোপালের বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হামদো তাদের কাছে গিয়ে বললে—শোন তোমার, রাজামশায় হুকুম দিয়েছেন। আজ সারারাত ধরে তোমাদের গোপালের নতুন পুকুরে মাটি কাটতে হবে।

হামদোর কথা শুনে সকলে ভয় পেয়ে গেল।

তাদের চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হামদো বললে—শিগগীর মাটি কাটতে শুরু কর। নইলে চাবুক মারতে মারতে মাটি কাটাব। এই কথা বলে কোদাল আর ঝুড়ি ফেলে দিল তাদের সামনে।

লোকগুলো আর কি করে সারারাত ধরে গোপালের পুকুরে মাটি কাটতে লাগলো।

সারারাত ধরে মাটি কেটে লোকগুলোর অবস্থা খুব কাহিল হ'য়ে পড়লো। কিন্তু কি করবে, রাজার হুকুম, অমান্য করলে বিপদ। তাই তারা সকাল হবার অপেক্ষায় রইলো।

পূবদিক ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে হামদো আর তার বন্ধু চলে গেল। লোকগুলো তখন আধমরা অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরাবার বসেছে!

সভাসদ, পরিষদ যে যার জায়গায় বসে আছে। গোপালও গম্ভীর মুখে বসে আছে তার আসনে, প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। চারদিকে লোক-লস্কর দাঁড়িয়ে। সভাগৃহ জমজমাট।

এমন সময় কতকগুলি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—মহারাজ! আমাদের রক্ষা করুন।

গোপাল মনে মনে বললে—কেমন। আর পরের হিংসা করবে? এরপর মুখে বললে— আচ্ছা যাও' পরের হিংসা ত্যাগ কর। তাহলে আর শাস্তি পেতে হবে না।

লোকগুলো তখন আস্তে আস্তে যে যার বাড়ী গেল। রাজসভা থেকে ফিরে গোপাল তার স্ত্রীকে বললে— দেখ গিন্নী। হামদোকে দিয়ে অনেক কাজ করলাম। আর তো হাতে তেমন কাজ-কর্ম নাই। তাছাড়া মহারাজ ও সন্দেহ করছেন। এবার হয়ত তিনি নিজেই খোঁজ খবর নিতে শুরু করবেন।

গিন্নী বললে— তাহলে উপায়?

গোপাল বললে— মাথায় কিছু আসছে না, তুমি একটা বুদ্ধি দাও।

গিন্নী বললে— এক কাজ কর, আজ হামদো এলে, তার কাছে কিছু টাকা কড়ি নিয়ে বিদায় করে দাও। ও সব ভূত-প্রেত নিয়ে আস করা ঠিক নয়। কখন কি বিপদ হবে বলা যায় না।

গোপাল বললে— ঠিক।

সেদিন আবার এসে হাজির হলো হামদো। এসেই বললে— কর্তা, আজ কি কাজ দাও।

গোপাল বললে— দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি।

হামদো বললে— কর্তা, আমি বরং তোমাকে কিছু টাকা আর গহণা দিচ্ছি, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

গোপালও তাই চায়। সে একগাল হেসে বললে— বেশ, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে তাই কর।

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিশে গেল হামদো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে টাকা আর গয়না ভর্তি একটা বাকসো এনে গোপালের হাতে দিয়ে বিদায় নিয়ে চিরদিনের মত চলে গেল।

গোপাল বাক্সভর্তি গয়না আর টাকা পেয়ে মনের আনন্দে এক রকম লাফাতে লাফাতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে গিন্নীর হাতে দিল।

গিন্নীতো টাকা আর গয়নার বাক্স পেয়ে হেসে লুটোপুটি। গোপালও একগাল হেসে বললে— বুঝলে গিন্নী আমার নাম গোপাল ভাঁড়।

হানা বাড়ীতে গোপাল ভাঁড়

তার পরদিন দাদু এসে বৈঠকখানায় বসতেই পেঁকো, লাল্টু বল্টু, পল্টু আর মিনি, বিনি এসে দাদুকে ঘিরে বসলে, তারপর সবাই বললে— দাদু, একটা গল্প বল।

দাদু— বলেলে— তাহলে আজও তোদের গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলব।

—শোন তাহলে। দাদু গল্প বলতে শুরু করলে।

চৈত্র মাসের শেষাশেষি গোপালের মেয়ের বাড়ী থেকে একখানি চিঠি এলো।

চিঠিখানা পড়ে তো গোপালের চক্ষুস্থির! বেয়াই মশায়ের খুব অসুখ, গোপালকে যেতে লিখেছে।

গোপালের গিন্নী বললে— একবার যাও না বাপু! বুড়ো মানুষ, ; কখন কি হয় বলা যায় না। যদি মরে টরে যায় তাহলে আর দেখা হবে না। কুটুম বাড়ী। সবাই নিন্দা করবে।

গিন্নীর আগ্রহ দেখে গোপাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হলো।

যখনকার কথা বলছি, তখন রেলগাড়ী ছিল না। কোথাও যেতে হলে পায়ে হেঁটে, কিংবা গরুর গাড়ীতে অথবা নৌকায় যেতে হতো।

গোপাল হেঁটে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

পরের দিন সকাল সকাল স্নান করে ভাত খেয়ে গোপাল বেরিয়ে পড়লো মেয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

মেয়ের বাড়ী ছিল বারো ক্রোশ দূরে। এতখানি পথ হেঁটে যাওয়া মুখের কথা নয়।

একে তো গোপাল ছিল নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি ওলা বেঁটে মানুষ। তার উপর গিন্নী মেয়ের জন্য নানা জিনিস জোগাড় করে পুটুলী বেঁধে দিয়েছে। সেই পুটুলী নিয়ে পথ চলতে গোপালের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কি করবে। আস্তে আস্তে হাঁটছিল।

কিছুদূর হাঁটে আর কোন গাছতলা দেখলেই তার তলায় বসে বিশ্রাম নেয়। এই ভাবে ক্রোশ চারেক পথ পার হতেই তার দুপুর গড়িয়ে গেল।

কোনক্রমে আরও ক্রোশ তিনেক পথ পার হতে গোপাল গলদঘর্ম হয়ে পড়লো। সামনে ছিল একটা বিরাট বটগাছ। গোপাল ক্লান্ত হয়ে তার তলায় গিয়ে বসলো।

গাছে হেলান দিয়ে বসতেই বটগাছের ঠাণ্ডা বাতাসে তার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। শ্রান্তিতে দু'চোখ জুড়িয়ে এলো তার। ঘুমিয়ে পড়লো গোপাল।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তার হুস নেই, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলে, সূর্য্যদেব পাটে বসেছে। গোপাল তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো।

এমন সময় পশ্চিম আকাশে একটুকরো কালো মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে। তখন চারিদিকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। আজ আর বুঝি রক্ষা নেই। কালবৈশাখীর ঝড়ে

কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কে জানে। আবার মাথায় বাজ পড়তেও পারে।

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গোপাল একরকম ছুটতে ছুটতেই পথ চলতে লাগলো একটা আশ্রয়ের আশায়।

প্রাণের ভয়ে এলোমেলো ভাবে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল এসে হাজির হলো একটা নদীর ধারে।

সামনে বা পিছনে কোনও লোকালয় দেখতে না পেয়ে গোপাল নদীর ধার দিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলো।

তখন বাতাস জোরে বইতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে কড় কড় করে বাজ পড়ছে।

গোপাল নিরূপায় হয়ে একটা আশ্রয়ের সন্ধানে অসহায়ভাবে চারিদিকে দেখতে লাগলো।

অন্ধকার রাত্রি।

হঠাৎ দূরে একটা গাছের মাথায় ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো। সেই শব্দে চমকে উঠলে গোপাল।

বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ দেখা গেল নদীর ধারে একটা দোতলা পাকাবাড়ী।

বাড়ীখানা দেখে গোপালের যেন প্রাণ ফিরে এলো। সে অন্ধকারে প্রাণপণে সেই বাড়ীটার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল।

তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

গোপাল কোনমতে এসে হাজির হলো বাড়ীর সামনে।

বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে গোপাল। কোনও সাড়াশব্দ নেই, চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। লোকজনের চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

গোপাল একটু ইতস্ততঃ করে দরজায় একটু ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল।

তখন খুব জোরে ঝড়ো বাতাস বইছে, আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিও পড়ছে মুষলধারে। ঘন ঘন বজ্রপাতও হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি বা প্রলয় হয়ে যাবে।

দরজা খুলে যেতেই ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে গোপাল দেখল, একখানা তক্তাপোেষ পাতা আছে, আর তার উপর একটা ময়লা চাদর বিছানো।

গোপাল তখন জয় মা কালী বলে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

একটু বিশ্রীম নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে গোপাল দেখল, বাড়ীটা পুরাতন হলেও বেশ মজবুত আছে। ঘরখানার মধ্যে চারদিকে ধূলা-ময়লা জমে আছে। বোধহয় বহুদিন ঘরটা পরিষ্কার করেনি। তক্তপোষের উপর যে চাদরখানা পাতা ছিল তাতেও একরাশ ধুলো পড়েছিল।

গোপাল চাদরখানি তুলে একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে আরাম করে বসল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে সে চিন্তা করছে কখন সকাল হবে। ক্ষিধেও তার পেয়েছিল খুব। একে তো গোপাল পেটুক মানুষ। তার উপর কখন সেই সাত সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, সেকি আর পেটে আছে। পথশ্রমে সব হজম হয়ে গেছে। ক্ষিধের জ্বালায় সে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কোনও উপায় নেই। তাই চুপচাপ বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে বাড়ীর ভেতর দিকে যেন কিসের শব্দ হলো।

গোপাল কানখাড়া করে শুনতে লাগলো। এবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। গোপাল ভেতরের দরজার দিকে চেয়ে রইলো।

হঠাৎ খুলে গেল ভেতরের দিকের দরজা। দরজায় দেখা গেল। একজন বয়স্ক লোক। সাদা কাপড়ে সারা দেহটা ঢাকা। গোপাল অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। তখন সেই লোকটি খনখনে গলায় বললে— আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

গোপাল প্রথমটা ভয় পেলেও সাহস করে বললে— মশায়, আমার বাড়ী কৃষ্ণনগর। নাম গোপাল। গোপাল বললে হয়ত চিনতে পারবেন না। গোপাল বাঁড় বলেই সকলে জানে। আমি মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিলাম, পথের মাঝে ঝড়-জল দুর্যোগে পড়ে প্রাণের ভয়ে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বুড়ো আবার খনখনে গলায় বললে—তাতে কি হয়েছে অনেকেরই এরকম অবস্থা হয়ে থাকে। তা বাড়ী থেকে কখন রওনা হয়েছেন?

—তা ধরুন বেলা দশটা এগারোটা হবে।

—বলেন কি? সারাদিন হাঁটছেন?

—কি আর করি বলুন? মোটা মানুষ বেশী জোরে তো হাঁটতে পারি না।

গোপালের কথায় লোকটা হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে চারদিক যেন কেঁপে উঠল। গোপালও ভয় পেয়ে গেল।

লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে—মেয়ের বাড়ী কোথায়?

—আজ্ঞে হরিনগর।

—ওরে বাবা। সে তো এখান থেকে প্রায় সাত ক্রোশ। আপনি ভুল পথে এসেছেন। তা আপনার বুঝি খাওয়া হয়নি?

খাবার কথা শুনে গোপালের বেশী করে ক্ষিধে বেড়ে গেল। কিন্তু সে তার প্রকাশ না করে বললে—আজ্ঞে সেই সকালে বাড়ী থেকে যা খেয়ে বেরিয়েছি। তা থাক, আপনাকে আর এতরাত্রে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না।

—সেকি কথা মশাই? আপনি হলেন আমার অতিথি। গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপোস থাকলে যে অমঙ্গল হবে। আপনি কি জাত?

—আজ্ঞে আমি পরামানিক অর্থাৎ নাপিত।

—বেশ—বেশ। তাহলে চিন্তার কারণ নেই। আমি খাবার যোগাড় করছি। এই কথা বলে লোকটা চলে গেল।

গোপাল স্পষ্ট দেখলে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে না উঠে, লম্বা তালগাছের মত একটা ঠ্যাং বাড়িয়ে দোতলায় উঠে গেল।

ব্যাপার দেখে গোপাল ভয়ে কাঠ। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে পালাবে কি করে। তাই সে বসে বসে রাম নাম জপ করতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। হঠাৎ পাশের ঘরে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে গোপাল ছাদের দিকে তাকাতেই তার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে এলো। গোপাল দেখলে দুটো জ্বলন্ত চোখ একদৃষ্টি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সাংঘাতিক সেই চোখ দুটো। যেন আগুনের গোলা।

গোপাল ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই একটা কালপ্যাঁচা ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল দরজা দিয়ে।

গোপাল হাফ ছেড়ে বাঁচল। ওটা তাহলে প্যাঁচার চোখ। আবার সে বসলো তক্তাপোষের উপর।

আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে নানারকম শব্দ হতে লাগল। মনে হলো যেন পাশের ঘরে একটা খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দুম-দাম -দুম-দাম শব্দে বাড়ীটা যেন সরগরম হয়ে গেল।

এইভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মনে হলো যেন হুড়মুড় করে দোতলার বারান্দা ভেঙ্গে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ আর তার সঙ্গে পৈশাচিক হাসির শব্দে গোটা বাড়ীখানা কেঁপে উঠলো।

গোপালের তখন অবস্থা কাহিল। তার বুক ধড়ফড় করছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ। কি করবে, কেমন করে সে এই হানাবাড়ী থেকে পালাবে এই চিন্তা করছে, এমন সময় দরজার কাছে দেখা গোল একটি নারীমূর্তি, সারা দেহ তার কাপড়ে ঢাকা। মুখ দেখা যাচ্ছেনা। সে খনখনে গলায় বললে—

—তুমি এখনি পালাও এখান থেকে। এটা হলো ভূতের বাড়ী। এ তল্লাটের লোক একে বলে হানাবাড়ী।

গোপাল এই কথা শুনি লাফিয়ে উঠে বেরোতে যাবে, এমন সময় আবার সেই স্ত্রীলোকটি নাকি সুরে বললে—তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর দেরী কোর না। একটু পরেই কর্তারা এসে তোমার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাবে। এই বলে সেই নারীমূর্ত্তিটি আগে চললো, গোপাল তার পিছনে যেতে লাগল।

কিছুটা এগিয়ে নারীমূর্ত্তিটি বললে—ওই নদীর ধার দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলেই গ্রাম দেখতে পাবে।

এই কথা বলে সেই নারীমূর্ত্তি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। গোপাল পিছন দিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গলে না।

দূর থেকে শুধু বহুকণ্ঠে পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল।

গোপাল প্রাণভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নদীর ধারে এক জায়গায় আছাড় খেয়ে জ্ঞান হারালো।

তখন ঝড় বৃষ্টি কমে গেছে। পূর্বদিক ফর্সা হয়েছে। জেলেরা ডিঙি নৌকায় চড়ে নদীতে মাছ ধরছিল। একজন লোককে নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে, তারা গোপালকে নৌকায় তুলে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই গোপালের জ্ঞান ফিরে এলো। জেলেদের মধ্যে একজন গোপালকে চিনত। সে জিজ্ঞাসা করলে— আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন?

গোপাল তখন সমস্ত ঘটনা বলতে, জেলেরা বললে—সর্বনাশ! ওটা তো হানাবাড়ী। ওখানে যে যায়, সে আর জ্যান্ত ফিরে আসে না। ভাগ্যের জোরে আপনি বেঁচে গেছেন। সন্ধ্যা হলে ও রাস্তায় লোকজন কেউ যায় না ভূতের ভয়ে।

গোপাল বললে— আচ্ছা, বাড়ীটার কি ব্যাপার বলতে পার?

জেলেরা বললে—ওই বাড়ীটা ছিল জমিদারের। জমিদারবাবু খুব রাগী ছিলেন। একদিন কি হয়েছিল বলতে পারব না। জমিদার নিজের হাতে সবাইকে খুন করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শেষ অবধি তাদের মৃতদেহেরও সৎকার করা হয়নি। শেয়াল-কুকুরে খেয়েছে।

সেই থেকে ওই বাড়ীটা হয়েছে ভূতের অস্তানা। দিনের বেলাতেও ওখানে কেউ যেতে সাহস পায় না।

গোপালের কাহিল অবস্থা দেখে জেলেরা নৌকা করে তাকে মেয়ের বাড়ীতে পৌছে দিল।

ভূতের বিয়েতে গোপাল ভাঁড়

তারপর দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় দাদু এসে বৈঠকাখায় বসতেই নাতি নাতনীরা এসে জড়ো হলো তার কাছে।

দাদু জিজ্ঞাসা করলে—কিরে কি খবর তোদের বল। আজ আবার কিছু ফরমাস আছে নাকি?

পল্টু, বললে—একটা গল্পের ফরমাস আছে দাদু!

দাদু বললে—বেশ, তাহলে সবাই চুপ করে বসো।

দাদুর সম্মতি পেয়ে সবাই তার চার পাশে গোল হয়ে বসলো।

দাদু আরাম করে তাকিয়া হেলান দিয়ে গল্প বলতে শুরু করলো।

জ্যৈষ্ঠ মাস। যেমন গরম পড়েছে, তেমনি বিয়েরও হিড়িক পড়েছে।

গোপালের এক আত্মীয়ের ছেলের বিয়ে। তাকে বরযাত্রী যেতে হবে।

গোপাল কিন্তু যেতে নারাজ। বললে—দেখ ভাই, ও সব নেমন্তন্ন খেয়ে আমার পোষায় না। শরীর খারাপ হয়। তাছাড়া কাজকম্ম রয়েছে। আমার দ্বারা বরযাত্রী যাওয়া হবে না।

বরের বাপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বললে—তুমি না গেলে বিয়েই হবে না। আমি বড় গলায় মেয়ের বাপকে বলেছি যে, তুমি বরযাত্রী যাবে। এখন তুমি যদি না যাও, তাহলে আমাকে কনের বাপের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে।

অনেক অনুরোধ করার পর শেষে রাজী হলো গোপাল ভাঁড়। বিয়ের দিন বিকালে সাজ-গোছ করে গোপাল বরযাত্রী হয়ে রওনা হলো বরের সঙ্গে।

গ্রামের মধ্যে গোপালের খুব মান-সম্মান ছিল, তাই অন্যান্য বরযাত্রীদের মধ্যে তাকেই সবাই মাতব্বর বলে মেনে নিল।

গোপালের গ্রাম থেকে বিয়ে বাড়ীটা মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। যথাসময় বর গিয়ে পৌছাল মেয়ের বাড়ীতে। মেয়ের বাবা যথাসাধ্য খাতির অভ্যর্থনা করল বরযাত্রীদের। বিশেষ করে গোপালকে বেশী খাতির করতে লাগলো সবাই। কারণ পোপাল হলো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য। তাঁর রাজসভায় কত সম্মান গোপালের। এত আর যা তা লোক নয়। কাজেই সবাই গোপালের খাতির যত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নির্দিষ্ট সময়ে শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আহারাদি শেষ হতে হতে একটু রাত্রি হয়ে গেল। এবার শোবার পালা।

অধিকাংশ বরযাত্রী খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই রওনা হলো বাড়ীর দিকে।

গোপাল কিন্তু চব্য-চুষ্য-লেহ্য পেয় খেয়ে পেটটাকে একেবারে জয় ঢাক করে তুলেছিল। কাজেই তার আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। সে কি করবে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো।

এমন সময় মেয়ের বাবা এসে বললে—গোপালবাবু। আজকে রাত্রিটা একটু কষ্ট করে গরীবের বাড়ীতে থাকুন। কাল সকালে চলে যাবেন।

গোপালের থাকার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে; বললে— না— না, তা কি হয়, বাড়ীতে আমার বিশেষ কাজ আছে।

মেয়ের বাবা বললে— কাল সকালে উঠেই চলে যাবেন। গরীবের বাড়ীতে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আজকের রাত্তির টুকু থেকে যান।

গোপাল তখন বললে— আচ্ছা তাই হবে। এত করে যখন বলছেন, তখন রাত্তিরটুকু কাটিয়েই যাই।

মেয়ের বাবা গোপালের সম্মতি পেয়ে খুশী হয়ে ভজা-ভজা বলে। চাকরকে ডাকতে লাগলো।

ভজা আসতেই মেয়ের বাবা বললে— শীগগীর গোপালবাবুর তামাক সেজে নিয়ে আয়, আর দু খিলি পান দিয়ে যা।

কর্তার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে ভজা একটা রেকাবীতে দু'খিলি পান। আর গড়গাঁড়ায় তামাক সেজে দিয়ে গেল।

গোপাল তখন আরাম করে বসে পান চিবুতে চিবুতে গড়গড়া টানতে লাগলো। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেয়ের বাবাকে বললে—আমি কিন্তু বাপু এই গরমে ঘরে শুতে পারবো না ; আর কারও সঙ্গে শুতে পারবো না। আমাকে তোমাদের বাইরের দালানে একটা বিছানা করে দাও।

গোপালের হুকুম মত মেয়ের বাবা তাদের বাইরের বাড়ীর দালানে রাস্তার ধারে একটি খাটিয়া পেতে বিছানা করে দিল।

গোপাল তখন খালি গায়ে ভুড়ি বার করে আরাম করে গড়গড় টানতে লাগলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করলো।

এদিকে হয়েছে কি! গোপাল যেখানে ঘুমুচ্ছিল, সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে মাঠের ধারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে ভূতের বিয়ে হচ্ছে।

সব যোগাড় পত্তির ঠিক। বরও এসে গেছে। এমন সময় দেখা গেল বামুন ঠাকুর নেই। বিয়ে দেবে কে? এই নিয়ে ভূতের দল চিন্তায় পড়ে গেল।

যার মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল, সে ছিল ভূতের সর্দার। সব শুনে সে রেগে গিয়ে সব ভূতেদের ডেকে বললে—যেখান থেকে পারিস একটা বামুন ধরে নিয়ে আয়।

একটা ভূত ভয়ে ভয়ে বললে—সর্দার! দিনের বেলাতেই এদিকে কেউ আসে না। আমাদের ভয়ে, এত রাত্রে কে আসবে বিয়ে দিতে।

সর্দার বললে— যত টাকা চায় আমি দক্ষিণা দেব। তোরা খোঁজ করে দেখ।

আর একটা ভূত বললে—যত টাকাই দক্ষিণা দাও সর্দার। প্রাণের ভয়ে কেউ এদিকে আসবে না।

এমন সময় লিকলিকে লম্বা হাত পা নাড়তে নাড়তে সেখানে এলো একটা পেত্নী। সেই হলো সর্দারের বৌ, মানে মেয়ের মা।

পেত্নীটা এসেই হাত-পা নেড়ে বললে— পাশের গাঁয়ের বামুনপাড়া থেকে একটা বামুন তুলে নিয়ে এসো।

সর্দার বললে—গিন্নী ঠিকই বলেছে, যেখান থেকে হোক একটা বামুন নিয়ে আয়। নইলে বিয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে।

নিরূপায় হয়ে তখন চারটে ভূত বেরিয়ে পড়লো বামুনের খোঁজে। এদিকে গোপাল রাস্তার ধারে খাটিয়ার উপর শুয়ে দিব্যি নাক— ডাকাচ্ছিল।

ভূতগুলো তখন বামুন খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছিল রাস্তার উপর দিয়ে গোপালের নাক ডাকার শব্দে তারা চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে গোপালের খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা ভূত ফিসফিস করে বললে—বপারে! কি সাংঘাতিক নাকের ডাকুনি রে বাবা! ভীষণ শক্তিশালী লোক মনে হচ্ছে।

আর একজন বললে—তা তো বটেই। দেখছিস না, কেমন ভুঁড়ি বাগিয়ে শুয়ে আছে।

তৃতীয় ভূতটা বললে— চেহারাটা কেমন নাদুস-নুদুস দেখছিস। গায়ে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে।

চতুর্থ ভূত বললে—এর মাংস কিন্তু খেতে খুব ভাল হবে।

প্রথম ভুত বললে—এ লোকটা বামুন কিনা তুই কি করে জানলি।

প্রথম ভূত বললে—দূর ব্যাটা হাঁদা। বামুন না হলে এমন নাদুস নুদুস চেহারা আর ভুড়ি হয়?

তৃতীয় ভূত বললে—ঠিক বলেছিস। বামুনদেরই এই চেহারা হয়।

দ্বিতীয় ভূত বললে—তাহলে একেই নিয়ে যাই চল।

সবাই রাজী হয়ে গেল। তখন প্রথম ভূতটা বললে—জেগে উঠলে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। তার চেয়ে খাটিয়া শুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে যাই চল।

সকলে বললে—খুব ভাল কথা, খাটিয়া শুদ্ধই নিয়ে যাব। এই বলে চারজনে খাটিয়া শুদ্ধ গোপালকে কাঁধে করে হাওয়ার বেগে এসে হাজির হলো তাদের বিয়ে বাড়ীতে।

সঙ্গে সঙ্গে পোঁ-পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল গোপালের। সে ধড়মড় করে। উঠে বসে চারদিকে চেয়ে দেখে অবাক হলো খুব, এবং সেই সঙ্গে ভয়ও হলো তার।

গোপাল দেখলে তার চারপাশে কালো কালো কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। সারাদেহ কাপড়ে ঢাকা, মুখও দেখা যাচ্ছে না। সবই কেমন যেন আবছা আবছা, কিছুই ভালভাবে দেখা

যাচ্ছে না।

হঠাৎ লোকগুলোর মধ্যে একজন নাকি সুরে বললে— এই, বাড়ীর মধ্যে খবর দে বামুন এসে গেছে।

বাড়ীর মধ্যে খবর দিতেই হি-হি করে হাসতে হাসতে কতকগুলো মেয়ে এসে হাজির হলো সেখানে। তার মধ্যে একটা মেয়ে খোঁনা গলায় বললে—চলুন বামুন ঠাকুর, বিয়ের সময় হয়েছে।

তাদের গলার আওয়াজ শুনে আর আবভাব দেখে গোপাল বুঝলে এরা মানুষ নয়, প্রেতাত্মা। খুব ভয় পেয়ে গেল সে।

কিন্তু গোপাল ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সে সাহসে ভর করে বললে— দেখ, রাস্তা দিয়ে যখন তোমার লোকেরা আমাকে নিয়ে আসছিল, তখন পৈতেটা কোথায় পড়ে গেছে।

এই কথা শুনে একজন এগিয়ে এসে বললে—তাতে কি হয়েছে ঠাকুর মশায়। আমরা পৈতা এনে দিচ্ছি, আপনি তৈরী করে নিন।

গোপাল দেখলে কোন উপায় নেই, আজ আর পৈতৃক প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হবে না। হায় হায়! কি ঝকমারী করতে বিয়ে দিতে

এসেছিলুম রে বাবা! যদি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি, আর কখনও বিয়ে দিতে আসছি না।

গোপালকে ইতস্তত করতে দেখে, সর্দার ভূতটা হেঁড়ে গলায় বললে—কি ভাবছেন ঠাকুর মশায়! আমরা আপনার উচিত মত দক্ষিণা দেব।

গোপাল মনে মনে ভাবতে লাগলো—যা দক্ষিণ পাচ্ছি, এতেই যথেষ্ট। এখন কোনরকমে প্রাণটা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি।

একটা মেয়ে বলে উঠল খোনা গলায়—কি হলো ঠাকুর মশায় চলুন।

গোপাল বললে— হ্যাঁ বাবা, চল যাচ্ছি— এই বলে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখে তো অবাক।

বিয়ের যোগাড় সব মানুষের মতই তৈরী। বরণডালা, ছাদনাতলা, ফুলের মালা সব যোগাড়। কিন্তু আলো খুবই কম, কেমন যেন একটা আবছা অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

গোপাল দেখলে প্রাণ বঁচাতে গেলে এরা যা বলছে তাই করতে হবে। তা না হলে হয় ত মটাক করে ঘাড় মটকে দেবে। এই ভেবে সে সূতো দিয়ে একটা পৈতে তৈরী করে গলায় ঝুলিয়ে বসে গেল বিয়ে দিতে।

ঠিক ঠিক মত কন্যা সম্প্রদান করালে, হস্তবন্ধনী, মালা-বদল করালে। মন্ত্র তো জানে না। কেবল অং ভং করে সারালে। বিয়ে হয়ে গেল, শাঁখ বেজে উঠলো পোঁ-পোঁ করে।

গোপাল তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তাই সে বললে –এবার আমায় দয়া করে ছেড়ে দাও বাবা।

সর্দার ভূত বললে—তাকি হয় ঠাকুর মশায়। খাওয়া দাওয়া সেরে, তারপর যাবেন।

গোপাল তখন তাড়াতাড়ি বললে—আমি হলুম সাত্বিক ব্রাহ্মণ। কারও বাড়ীতে জলগ্রহণ করি না, অতএব আমাকে ছেড়ে দাও।

—তাহলে আপনার দক্ষিণাটা নিন। এই বলে একটা ছোট থলে গোপালকে দিয়ে বললে,—এতে ৫০০ শত টাকা আছে, আর এই সোনার আংটিটা আপনি হাতে পারবেন। আমাদের কথা তাহলে মনে থাকবে।

গোপাল মনে মনে ভাবলে—খুব মনে থাকবে বাবা, হাড়ে হাড়ে মনে থাকবে। একবার পালাতে পারলে বাঁচি। তারপর প্রকাশ্যে বললে—আচ্ছা বাবা সব তাহলে আমি চলি।

সর্দার ভূত বললে—কি করে যাবেন ঠাকুর মশায়?

গোপাল ভয় পেয়ে বললে—কেন?

—সামনেই জলার ধারে শ্যাওড়া গাছে একটা শাঁকচুন্নী আছে। ওটা খুব পাজী। আপনাকে দেখলেই ঘাড় মটকাবে।

গোপাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে— তাহলে উপায়?

—ভয় নেই। ঠাকুর মশায়! আমরা আপনাকে পৌছে দিচ্ছি। এই বলে সেই চারজনকে ডেকে সর্দার ভূত হুকুম দিলে—যা, ঠাকুর মশায়কে ভোর হবার আগে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে রেখে অয়।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন ভূত গোপালের খাটিয়াখানা নিয়ে এলো, গোপাল আংটিটা আঙুলে পরে টাকার থলিটাকে ভাল ভাবে কাপড়ে বেঁধে খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

চারজন ভূত সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া শুদ্ধ গোপালকে নিয়ে হাওয়ার বেগে এনে হাজির করলে নির্দিষ্ট জায়গায়।

তারপর ভূত চারটে গোপালের পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় নিল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে।

বাড়ীতে এসে গিন্নীকে সব কথা বলতেই গিন্নী বললে— বল কিগো! তাহলে তো তোমার লাভই হয়েছে।

গোপাল হাসতে হাসতে বললে— নিশ্চয়। আমার নাম গোপাল ভাঁড়। লাভ ছাড়া লোকসান বুঝি না। এই বলে টাকার থলিটা গিন্নীর হাতে দিল।

গোপালের পাল্লায় মামদো

সেদিন সকাল সকাল বেড়িয়ে এসে দাদু বৈঠখানায় বসতেই রোজকার মতো নাতি-নাতনীরা এসে হাজির হলো বৈঠকখানায়।

দাদু তাদের দেখে বললে—কিরে, সব এসে গেছিস? বস সবাই, গল্প বলছি।

দাদুর চারপাশে বসে পড়ল সবাই। দাদু তখন একটু নড়েচড়ে বসে, একটু গলাঝাড়া দিয়ে শুরু করলে।

আগেই তোমাদের বলেছি, গোপাল শুধু রসিক লোকই ছিল না! অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। গোপাল লেখাপড়া বিশেষ জানত না, যেটুকু জানত, তাকে মূর্খ বলাই ভাল।

কিন্তু মূর্খ হয়েও গোপাল নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

এবার যে গল্পটা তোমাদের বলবো, সেটা শুনলেই বুঝতে পারবে গোপালের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ ছিল।

গোপাল ভাঁড় যে গ্রামে বাস করত, সেই গ্রামখানি ছিল বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। বামুন, কায়েত, কামার, কুমোর, মুচি, মুসলমান সব জাতেরই বাস ছিল গ্রামটিতে।

সে সময়কার মানুষের মনে এত হিংসা ছিল না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করত খুশী মনে। বামুনপাড়ার ছেলেরা আনন্দে খেলা করতে যেত মুসলমান পাড়ায়। আবার মুসলমান পাড়ার ছেলেরা আসতে বামুন

পাড়ায়। বামুন কায়েতের অল্প বয়সী ছেলেরা বয়স্ক মুসলমানকে দাদা বা চাচা বলে সম্বোধন করত, তাদের সামনে বিড়ি সিগারেট খেত না। এইভাবে আনন্দেই কাটতো তখনকার মানুষের দিনগুলো।

একদিন দুপুরবেলা গোপাল ঘরের দাওয়ায় বসে আহারাদি সেরে তামাক টানছে, এমন সময় গফুর মিঞা এসে বসলো তার কাছে গোপাল তার দিকে কলকেটা বাড়িয়ে দিতে গফুর বেশ কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কলকেটা গোপালের হাতে ফেরৎ দিলে।

গোপাল বললে—কি খবর গফুর ভাই? এই দুপুরবেলা কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও যাইনি ভাই। তোমার কাছেই এলাম।

—কি ব্যাপার বল দেখি ভায়া?

—একটা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলাম।

—কেন, কি আবার বিপদ হলো?

—ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ কাণ্ড-কারখানা দেখে, দিন দিন আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি। রাত্তির বেলা ছেলেমেয়েরা তো ভয়ে ঘুমাতেই পারে না। আমাকেও সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়।

—ব্যাপারটা কি বল দেখি?

—প্রত্যেকদিন রাত্রিবারোটার পর, আমাদের বাড়ীতে ভূত আসে।

এই কথা শুনে গোপাল হো-হো করে হেসে বললে—দূর পাগল! ভূত কি কখনও ঘরে আসতে পারে? তেনারা হল গিয়ে অপদেবতা। শ্মশানে-

মশানে, বনে-জঙ্গলে, পোড়ো বাড়ীতে, গাছপালায় থাকে। মানুষের বাস করা জায়গায় তেনারা থাকে না।

গফুর বললেমামদে আমিও তাই জানতুম, কিন্তু এখন দেখছি বাড়ীতেও ভূত থাকে।

গোপাল বললে—কি করে বুঝলে?

গফুর তখন গোপালের কলকেটা নিয়ে বার কতক বেশ জোরে টান দিয়ে বলতে শুরু করলে।

প্রায় একমাস আগের ঘটনা।

একদিন রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, গোটা পাড়াটাই নিস্তব্ধ। কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই, মাঝে মাঝে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে। গভীর রাত, সারাদিন পরিশ্রমের পর খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। স্পষ্ট ঘরের মধ্যে একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আবার সব চুপচাপ। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। মনে ভাবলাম, ঘরের মধ্যে বোধহয় গেছে। ইঁদুর ঢুকেছে। এইবার ধানের বস্তা, কাপড় চোপড় সব কেটে নষ্ট করবে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বালালাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু দেখা গেল না, তখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু তন্দ্রামত এসেছে, আবার একটা শব্দ হলো। এবার আর বিছানা থেকে উঠলাম না, কিন্তু ঘুমাতেও পারলাম না সারারাত শব্দের জন্যে।

এইভাবে রোজই ঘরের মধ্যে নানারকম শব্দ হতে লাগলো। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক দিন সকালে উঠে দেখি সারা উঠোনে মুরগীর পালক ছড়ানো। সন্ধান করে জানলাম, আমাদের বড় মুরগীটাকে কাল রাত্রে কিসে খেয়ে গেছে। তার অর্ধেক অংশ মুরগীর ঘরের সামনে পড়ে আছে।

চার-পাঁচদিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। কিন্তু চার-পাঁচ দিন পরে সকাল বেলা গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখি একটা বকরী মরে পড়ে আছে। তার দেহ থেকে কে যেন মাংস খুবলে খুবলে খেয়েছে। ব্যাপার দেখে বেশ ভয় হলো।

গোপাল বললে—আমার মনে হচ্ছে। এ সব শেয়ালের কীর্তি। তুমি একটু সাবধান সতর্ক থাকলেই বুঝতে পারবে।

গফুর দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে প্রতিবাদের সুরে বললে—না ভায়া! এটা শেয়ালের কীর্তি নয়।

গোপাল জিজ্ঞাসা কয়লে—কি করে বুঝলে?

গফুর বললে—আমিও তোমার মত শেয়ালের কীর্তি বলে মনে করেছিলুম। কিন্তু তিনদিন আগে ঘরে শুয়ে আছি। রাত্রি তখন প্রায় দু'টো, এমন সময় দরজাটা খট্ করে নড়ে উঠল। সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকারেই দরজার দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো বোধহয় ঘরে কেউ ঢুকেছে। উঠে বসে রইলাম বিছানার উপর। আর কিছুই দেখা গেল না বা শোনা গেল না। সকালে উঠে নিজের কাজে গেলাম। কাকেও কিছু বললাম না। মনে ভাবলাম, বাড়ীতে এই কথা বললে সকলে ভয় পেয়ে যাবে। তাই চুপ করে। গেলাম। আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম, কাকেও সেটা জানালাম না।

গতকাল রাত্রে ঘটে গেল একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

গোপাল আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কাল রাত্রে আবার কি হলো?

গফুর বলতে শুরু করলো।

কাল রাত্রে রোজাকার মত খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম, এই ক'দিনের ঘটনাগুলোর কথা।

রাত তখন কত হয়েছে বলতে পারছি না, তবে চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। বাড়ীর সকলে ঘুমিয়েছে। কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই... গোটা পাড়াটাই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

এমন সময়, দরজাটা খটখট করে খুলে গেল সামান্য। আমিও চেয়ে রইলাম সেদিকে। কিন্তু কাকেও দেখা গেল না। আবার আপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তখন আমার খুব ভয় হলো, সারা দেহের মধ্যে যেন বয়ে গেল একটা ঠাণ্ডা বাতাস। সারাদেহ, শির শির করতে লাগলো। কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময় হঠাৎ খুলে গেল মশারির এক পাশের দড়িটা। আমি ভাবলাম, নিশ্চয় ইঁদুরে দড়ি কেটে দিয়েছে। কি আর করি, উঠে আবার দড়িটা বাঁধলাম। মাত্র ঘণ্টাখানেক চুপচাপ কাটল, তারপরেই মনে হলো, কেউ যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকারে চেয়ে দেখি, ঘরের কোণে খুব লম্বা একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি আমার দিকে।

এই সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ভয়ে সেদিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। চেঁচিয়ে বাড়ীর লোকজনকে ডাকতে গেলাম, কিন্তু মনে হলো, কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছে। এমন সময়

হি-হি করে অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠল মূর্তিটা। আমি গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, আমি দাওয়ায় শুয়ে আছি, আর পাড়ার সকলে এসে জড়ো হয়েছে উঠোনে।

লতিফ মিঞা এগিয়ে এসে আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কি হয়েছিল রে বেটা, গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয়েছিলি কেন? আমি তখন আগাগোড়া সব কথা তাকে বললাম। বুড়ো সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—বপজান। তুমি একবার গোপালের কাছে যাও, সে খুব বুদ্ধিমান। তাকে গিয়ে সব ঘটনা বল, তারপর সে যা বলবে তাই হবে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি ভাই। এর একটা যা হোক বিহিত কর। নইলে ছেলেপুলে নিয়ে মারা যাব।

গোপাল বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করে বলল—দেখ গফুর ভাই, আমি তো আর রোজা নাই যে ভূত ছাড়াব। তবে তুমি যখন বলছ একবার তোমার বাড়ী গিয়ে দেখতে পারি।

এই কথা বলে গফুরকে বিদায় দিয়ে গোপাল ভালভাবে একটা ঘুম দিয়ে নিলে।

ঘুম থেকে উঠে গোপাল সন্ধ্যার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে গফুর মিঞার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি হতে লাগলো। গোপালের জন্য গফুর ভাল করে বিছানা-পত্র করে রেখেছিল, গোপাল আরাম করে তাতে শুয়ে পড়লো। গফুরও সেই ঘরেই রইলো। তারপর গল্প করতে লাগলো দু'জনে।

রাত যখন প্রায় দুটো, এমন সময় ঘরের চালের উপর একটা শব্দ হলো, মনে হলো যেন কেউ একটা মস্ত বড় বস্তা চালের উপর ফেলে দিলে।

পরক্ষণেই দরজা খোলার শব্দ হলো। ওরা দুজনেই চেয়ে দেখলো কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

রাত্রি ভোর হতে আর অল্প বাকি। গোপাল বিছানার উপর বসলো। তারপর গফুরকে বললে— গফুর। ভূত-প্রেত কিছু নয়। সব তোমার মনের ভ্রম। এই বলে সে উঠে পড়লো।

গফুরের বাড়ীর পিছন দিকে ছিল একটা কথবেলের গাছ। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সেই গাছের তলায় সারাদিন খেলা করত। গোপাল সেইদিকে যেতে লাগল। কিছু এগিয়ে সে দেখতে পেলে, সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গে ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। গোপাল সাহস করে চেয়ে দেখলে। তার মনে হলো ছায়ামূর্তিটার দাড়ি আছে। আর বিরাট লম্বা সেই ছায়ামূর্তির চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মত জ্বলছে। গোপাল বুঝতে পারলে সেটা মুসলমান ভুত।

এর আগে দু' একবার ভূতের পাল্লায় পড়ে গোপালের সাহস হয়েছিল। তাই সে ভয় না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ভূতটাকে। আর মনে মনে বললে—দাঁড়া ব্যাটা মামদো। আজ রাত্রে তোর দফা রফা করবো।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। মুরগীগুলো আর গাছপালার পাখীগুলো ডেকে উঠলো। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তিটার মিলিয়ে গেল। গোপাল তখন নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এলো গফুরের কাছে।

গফুর তখন বিছানায় উঠে বসেছে। গোপাল তাকে এক ছিলিম তামাক সেজে আনতে বললে। তারপর তামাক খেতে খেতে গম্ভীর ভাবে বললে—দেখ গফুর ভাই। তোমার বাড়ীতে একটা মামদো ভূত আসা যাওয়া করছে। সেই ব্যাটাই তোমার ঘরে রোজ রাত্রে এত উপদ্রব করে।

এই কথা শুনে গফুর খুব ভয় পেয়ে বললে—তাহলে কি হবে ভাই?

গোপাল বললে—আজকেও রাত্রে আমি আসব, তারপর দেখি কি করা যায়। এই বলে বিদায় নিয়ে গোপাল বাড়ী ফিরে গেল।

তার পরদিন সন্ধ্যায় গোপাল আহারাদি সেরে গফুরের বাড়ীর দিকে রওনা হলো। যাবার সময় সঙ্গে নিলে একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুটলী, একটা মাটির হাঁড়ি, একটা ক্ষুর, একটা আয়না, গোটা কতক শুকনো লঙ্কা আর সরষে। একটা বাটীতে রান্না করা খাসির মাংস।

দেখতে দেখতে রাত বেড়ে চললো। গফুরের বাড়ীর সবাই যে যার শুতে গেল।

গোপাল আর গফুর আগের দিনের মত একঘরে শুয়ে পড়লো। শোবার আগে গোপাল যে সব জিনিস সঙ্গে এনেছিল, সব হাতের সামনে সাজিয়ে রাখল।

গল্প করতে করতে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

হঠাৎ খট্ করে দরজাটা একটু ফাঁক হলো। তারা স্পষ্ট দেখল। একটা ছায়ামূর্তি সেই দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কোন সাড়া শব্দ না দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলো।

ছায়ামূর্তিটা ঘরের ভিতরে চারপাশে ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। গোপাল স্পষ্ট দেখলে সেটা মামদো ভুত।

গোপাল আস্তে আস্তে উঠে সেই হাঁড়িটার মধ্যে মুখ রেখে বললে কে রে ওখানে?

আচমকা এমন গম্ভীর আওয়াজ শুনে মামদোটা বুঝি ঘাবড়ে গেল। সে স্থির হয়ে সেই ঘরের কোণেই দাঁড়িয়ে রইল।

গোপাল আবার সেইভাবে বললে—কিরে কথা কানো যাচ্ছে না বুঝি? উত্তর না দিলে তোকে দর্পণ বাণে বেঁধে লঙ্কার ধোঁয়া দেব।

এই কথায় মামদোটা আরও ঘাবড়ে গিয়েমামদে খনখনে গলায় বললেমামদে দোহাই তোমার, আমাকে দর্পণ বাণ মেরো না। আমি মামদো।

—কি বললি, তুই মামদো? তাহলে তো ভালই হলো। তোর জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমার তিনটে মামদো আছে, আর একটা মামদো হলেই এক গণ্ডা হবে।

গোপালের কথা শুনে মামদোটা হি-হি করে হেসে উঠল। তাই দেখে গোপাল রেগে গিয়ে বললে— হাসি হচ্ছে। দেখবি আমার কাছে ক'টা মামদো আছে।

মামদোটা বললেমামদেকই দেখাও দেখি।

গোপাল তখন আয়নাটা নিয়ে মামদোর মুখের সামনে ধরলে। আয়নায় মুখের ছায়া পড়তেই মামদোটা চমকে উঠে বললে—

তোমায়। আমায় ছেড়ে দাও।

সুযোগ পেয়ে গোপাল বললে—তাকি হয়, অনেকদিন ধরে আমি একটা মামদো খুঁজছিলাম। এতদিন পরে যখন পেয়েছি, তখন কি ছেড়ে দেওয়া যায়।

মামদো তখন খুব অনুনয় বিনয় করতে লাগলো।

গোপাল বললে—না না, তোকে ছাড়া হবে না। এই দ্যাখ, আমার কাছেই একটা মামদোর মাথা রয়েছে। এই বলে অন্ধকারে কাপড়ের পুটলিটা দেখালে। তারপর ক্ষুরটা দেখিয়ে বললে—এটা দিয়ে তোর দাড়ি গোঁফ কামাব। তারপর লঙ্কার ধোঁয়া দোব, আর এই হারামের মাংস খাওয়াব। তবে আমার কাজ শেষ হবে।

হারাম হলো শূয়ার। মুসলমানরা কখনও এই মাংস ছোয় না। তাই হারামের মাংসের কথা শুনে মামদো বললো—তোবা তোবা।

গোপাল বললে—তোবা তোবা করলে কি হবে। তোকে আজ আমি এই মাংস খাইয়ে ছাড়বো। এই বলে মাংসের বাটি নিয়ে গোপাল উঠে দাঁড়াল।

মামদোটা তখন খুব ঘাবড়ে গিয়ে নাকি সুরে বললে—আমায় ছেড়ে দাও বাবা। আর কখনও এমুখো হবে না। দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও।

গোপাল দেখলে ওষুধ ধরেছে। তার সাহস খুব বেড়ে গেল। সে হেঁড়ে গলায় হাঁড়িতে মুখ রেখে বললে—তুই গফুরের বাড়ীতে অনেকদিন ধরে উৎপাত করছিস, তার মুরগী মেরেছিস, বকরী মেরেছিস। তোকে কি করে ছাড়বো বল?

মামদোটা তখন বললে—আমি তার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি। ছেড়ে দে বাবা।

গোপাল বললে—কি ক্ষতিপূরণ দিবি বল?

মামদো বললে—এই বাড়ীর পিছনে যে কথবেলের গাছটা আছে। তার পাশেই আছে একটা উঁচু ঢিপি। বহুদিন আগে ওখানে ছিল আমার আস্তানা। আমার কাছে ছিল নবাবী আমলের চারখানা মোহর।

গফুরের ঠাকুর্দা আমার কাছে যেত, গাঁজা খেত গল্প করত। একদিন কথায় কথায় তাকে ওই মোহর চারটি আর টাকার কথা বললাম। সে সব শুনে কিছু বললে না।

এর কয়েকদিন পরে এক বাটি গোস্ত এনে আমাকে বললে— ফকির সাহেব। এটা তুমি খাবে। আজ পরবের দিন। বাড়ীতে গোস্ত হয়েছিল, তোমাকে খেতে দিয়ে গেলাম। তাতে ছিল বিষ মেশানো। আমি সরল বিশ্বাসে সেই গোস্ত খেয়ে মারা যাই। তারপর আমাকে কবর দিয়ে গফুরের ঠাকুর্দা মোহর আর টাকা চুরি করে এনে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে মাটির নীচে পুঁতে রাখে। এ কথা কিন্তু মরবার সময় সে কাউকে বলে যেতে পারে নি। সেই থেকে আমার মাোহর আর টাকাগুলো এখানেই পোঁতা আছে। সেইজন্যে আমি রোজ এখানে আসি।

গোপাল বললে—মামদে ভাল কথা। কিন্তু তুমি ফকীর, তোমার এত লোভ থাকা তো ভাল নয়। এই লোভের জন্যই আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

মামদো বললেনা—না বাবা! আর শাস্তি দিতে হবে না। আমার অনেক শাস্তি হয়েছে। এবার আমাকে ছেড়ে দাও। গফুরের ঠাকুরদাকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছি। গফুরের বাবাকে শাস্তি দিয়েছি।

গোপাল বললে—কি ভাবে শাস্তি দিয়েছ?

মামদো বললে—গফুরের ঠাকুরদা রাত্রে শুয়েছিল, আমি তার গলা টিপে মেরেছি। সকাল বেলা সকলে তার মৃতদেহটা দেখে বলেছিল যে সন্ন্যাস রোগে মারা গেছে।

এতেও আমার রাগ যায়নি। এদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না, এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাই সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

একদিন দেখি গফুরের আব্বাজান ক্ষেতের কাজকর্ম সেরে বাড়ী ফিরছে, সেই সময় আরম্ভ হলো বৃষ্টি আর ঝড়। সে একটা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল, আমিও সুযোগ বুঝে গাছের ডাল ভেঙ্গে ফেললাম তার মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

মামদো আবার বললে—এরপর ছিল গফুরের পালা। তুমি না এসে পড়লে ওকেও শেষ করে দিতুম। তারপর ওর ব্যাটা দুটো আর বিবিকে শেষ করতুম। কিন্তু তা আর হলো আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ঘরের মেঝে খুঁড়লে একটা পিতলের ঘট পাবে। তাঁর মধ্যে রয়েছে চারটি মোহর আর পাঁচশ' টাকা। ওগুলো নিয়ে তোমরা আমার উদ্দেশ্যে মৌলভীদের ডেকে কোরণ পাঠ করাবে। তিনদিন এই কোরণ পাঠ করবে। শেষদিনে মৌলভী আর ফকিরদের ডেকে এনে ভোজ দেবে। তাহলে আমার আত্মার মুক্তি হবে।

এই পর্যন্ত বলে গোপালের কাছে বিদায় নিয়ে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি। ঘরের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল।

তখন ভাোর হয়ে এসেছে। — গফুর আর গোপাল ঘরের মেঝে, খুঁড়ে সেই মোহর আর অর্থ পেল। সেই অর্থ কিছু খরচ করে তারা মামদোর

কথামত কোরাণ পাঠ করালে, ভোজ দিলে। তারপর অবশিষ্ট টাকা আর মোহর দু'জনে ভাগ করে নিয়ে মনের আনন্দে যে যার বাড়ীতে গেল।